মোহাম্মদ কুতুব

ইসলাম ও নারী

মোহাম্মদ কুতুব

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৭১

৭ম প্রকাশ
শাবান ১৪৩০
ভাদ্র ১৪১৬
আগস্ট ২০০৯

বিনিময় মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAM-O-NARI by Mohammad Qutub. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 10.00 Only.

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলাম ও নারী

নারীর অধিকার নিয়ে উদগ্র এক উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে আজ প্রাচ্য জগত। তোলপাড় চলছে পুরুষের সাথে তার নিখাদ সমতার দাবীতে। নারীর অধিকারের অতি হুজুগে প্রবক্তাদের মধ্যে আছে এমন এক শ্রেণীর পুরুষ ও নারী যারা বিকারগ্রস্ত বাতুলের মতো কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছে ইসলামের নামে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম নারী এবং পুরুষের মধ্যে বজায় রেখেছে পরিপূর্ণ সমতা, এমন বল্গাহীন ফতোয়াও দিচ্ছে এদের কেউ কেউ দুষ্টবুদ্ধি তাড়িত হয়ে। আর একদল আছে ইসলাম সম্পর্কে যাদের বক্তব্য চরম মুর্খতার নামান্তর। কিংবা কোনো কিছু না জেনেই তারা উদ্‌গার করছে বাষ্প। এদের জ্ঞানের বহর দেখে করুণার উদ্রেক হয়। এ বাচালের দল বলছে, ইসলাম নারীর শত্রু। বুদ্ধির ক্ষীণতার অজুহাত দেখিয়ে ইসলাম নাকি খাটো করেছে নারীর মর্যাদা। তাকে নামিয়ে এনেছে অধস্তন প্রাণীর সমপর্যায়ে। এদের মতে, নারীকে অবনত করে তাকে কেবলমাত্র পুরুষের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপকরণ আর মানব বংশবৃদ্ধির যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে এ অনুশাসনে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী কি পরিমাণে পুরুষের আজ্ঞাবহ আর কিভাবে পুরুষ তার ওপর সর্বাত্মক আধিপত্য ভোগ করছে এটা প্রমাণ করার জন্য এ ধরনের খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে এরা।

এ উভয় শ্রেণীর লোকই ইসলাম সম্পর্কে সমান অজ্ঞ কিংবা বলা যায় ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের প্রতারিত করে সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অশুভ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই এরা সত্যকে এভাবে মিথ্যার সাথে তালগোল পাকিয়ে পানি ঘোলা করতে নেমেছে।

ইসলামে নারীর স্থান কতখানি তার ওপর বিশদ আলোচনা শুরু করার আগে প্রথমে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু আলোকপাত করতে চাই ইউরোপের নারীমুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে। কেননা, আধুনিক প্রাচ্য জগতের সব বিভ্রান্তি আর অশুভ প্রবণতার মূল উৎস এ একটি জায়গায়।

গোটা ইউরোপে এবং বলতে গেলে তাবৎ দুনিয়ায় চরম উপেক্ষিত ছিল নারী। তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হতো। অস্বীকার করা হতো তার স্বতন্ত্র

অস্তিত্ব। 'পণ্ডিত' এবং 'দার্শনিক' সমাজে বহু অনুসন্ধিৎসা, মুখরোচক আলোচনা আর বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল নারী। এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতণ্ডা করতেন সেকালের ইউরোপের তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা। নারীর কি আদৌ কোনো আত্মা আছে ? যদি সত্যি থেকে থাকে তাহলে সে আত্মার স্বরূপটা কী ? ওটা কি মানুষের, না জন্তুর ? মানুষের আত্মা হয়ে থাকলে পুরুষের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিভাবে নির্ণীত হবে তার সামাজিক কিংবা মানসিক স্থান ? পুরুষের সেবাদাসী হিসেবে কি জন্ম হয়েছে তার ? কিংবা দাসীর চেয়ে কিঞ্চিত ওপরে নারীর স্থান ?

ইতিহাসের যুগ-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত একটি পরিসরে নারী যখন কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো সামাজিক পটভূমিতে, তখনো কিন্তু অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। আমরা এখানে গ্রীক এবং রোমান সাম্রাজ্যের সেই বহু কথিত চরম উৎকর্ষের যুগের কথা বলছি। এ যুগের নারীর সব মহিমা এবং আধিপত্যকে সাধারণভাবে নারী সমাজের উৎকর্ষ কিংবা প্রতিষ্ঠা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না কোনো মতেই। রাজধানী নগরীগুলোতে বাস করতেন এমন কিছু সংখ্যক অসামান্য রূপবতী এবং অভিজাত পরিবারের মহিলাই প্রতিষ্ঠার চূড়ায় উঠেছিলেন গ্রীক আর রোমান যুগে। সামাজিক জৌলুস আর অনুষ্ঠানের শোভা বাড়াতেন এ রমণীকুল। ইন্দ্রিয়পরায়ণ সৌখিন ধনপতিদের এরা ছিলেন লীলা-সঙ্গিনী, তাদের চিত্ত বিনোদনের উপচার। নিজেদের ঐশ্বর্য এবং কৌলিন্যের প্রতাপ জাহির করার জন্যই সামাজিক উৎসব আর ক্রিয়াকলাপে রূপবতী এসব মহিলার উপস্থিতিকে নন্দিত করতো ধনবান আত্মগর্বী পুরুষরা। কিন্তু এর থেকে এটা বুঝা যায় না, মানুষ হিসেবে নারী কোনো সম্মান এবং শ্রদ্ধার আসন পেয়েছে। আসলে আনন্দের খোরাক হিসেবেই লোক সমাজে বিচরণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল তাকে।

ভূমিদাস প্রথা আর সামন্ত আধিপত্যের যুগেও নারীর এ সামাজিক অবস্থা ছিল অপরিবর্তিত। নিজের অজ্ঞতার কারণে সে কখনো বিলাসের স্রোতে, কখনো উদ্দাম বল্গাহীনতায় দিয়েছিল গা ভাসিয়ে। আবার কখনো পশুর মতো তৃপ্ত থাকলো পান-ভোজনে আর সন্তান উৎপাদনে। তৃপ্ত থাকলো অন্যের ভোগের সামগ্রী হয়ে, রাত-দিন গতর খেটে।

এরপর ইউরোপে এলো শিল্প-বিপ্লব। কিন্তু এ পরিবর্তন নারীর জন্য আনলো আরো বেশী দুর্গতি, গ্লানি এবং যন্ত্রণা। মানব জাতির ইতিহাসে

আগাগোড়া যে লাঞ্ছনা সে ভোগ করে এসেছে, তার সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায় এ তিক্ততম নতুন অভিজ্ঞতা।

সব ক'টি যুগে ইউরোপ নারীর প্রতি দেখিয়ে এসেছে এমন রূঢ় অনীহা, উপেক্ষা এবং ঘৃণা। এ দৃষ্টিভংগীতে উদারতা এবং প্রশস্তচিত্ততা দু'য়েরই ছিল চরম অভাব। ইউরোপীয় সমাজের প্রকৃতিগত এ মনোভঙ্গির ফলে পুরুষদের কঠোর শ্রম করতে হয়েছে কোনো প্রত্যক্ষ কিংবা বস্তুগত ফায়দা ছাড়াই। অবশ্য সামন্ত যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং কৃষি-বৃত্তিতে পরিবর্তন নারীর ভরণ-পোষণে বাধ্য করলো পুরুষকে। এটা ছিল যুগের ধারার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। তাহলেও সেকালে একদম অলস বসে থাকলো না মেয়েরা। সব কৃষি সমাজে দেখা যায় এমন সব ছোট-খাটো কুটীর শিল্পের কাজ করতো তারা। এভাবে পুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতার মূল্য শোধ করলো তারা নিজেদের শ্রমের কড়ি দিয়ে।

ইউরোপের গোটা সামাজিক দৃশ্যপট বদলে যায় শিল্পবিপ্লবের অভিঘাতে। শহরের মতো গ্রামীণ জীবনেও সূচিত হয় এক আমূল পরিবর্তন। পুরোপুরি ভেঙ্গে যায় পারিবারিক জীবনের ভিত। নারী এবং শিশুরা বাধ্য হয় ঘর ছেড়ে কল-কারখানায় কাজ করতে। আগে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্নেহ-মমতার যে একটা গভীর বন্ধন ছিল, এ পরিবর্তনের ধাক্কায় তা একদম শিথিল হয়ে পড়ে। যৌথ দায়িত্ব-বোধ আর সমবায়িক নীতিতে এতকাল সুসংবদ্ধ ছিল গ্রামীণ জীবন। শ্রমিক শ্রেণী আস্তে আস্তে এ জীবন ছেড়ে শহরে এসে ওঠে। শহরের জীবন ছিল একটি বদ্ধ নিঃসঙ্গ জীবন। এখানে কেউ কারো ধার ধারতো না। খবর রাখতো না ঘরের কাছের পড়শীর। এ আত্মকেন্দ্রিক জীবনে অন্যের প্রতি দাক্ষিণ্যের এবং উদার সহানুভূতির মনোভাব হারিয়ে ফেলে মানুষ। তারা একা কাজ করতো এবং রোজগার করতো শুধু নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য, নিজের ভরণ-পোষণের জন্য। স্বার্থপর এ পরিবেশে পুরাতন সব মূল্যবোধ গেলো উবে। উপেক্ষিত হলো সাবেক যুগের নৈতিক অনুশাসন এবং চারিত্রিক নীতিবোধ। এসবের প্রতি আর কারো কোনোরকম শ্রদ্ধা ছিল না। উচ্ছৃঙ্খল আর অনাচারী হয়ে পড়লো পুরুষের মতো নারীরাও। বিসর্জিত হলো চরিত্র-গৌরব। নৈতিকতার আর কোনো তোয়াক্কা করলো না তারা, সুযোগ পেলেই হন্যে হয়ে তৃপ্ত করতো জৈবিক ক্ষুধা। অশুভ এ প্রবণতার ফলে বৈবাহিক জীবন এবং পরিবার প্রতিপালনে চরম রকমের একটা অনীহা সৃষ্টি হলো এ শ্রেণীর লোকের

মধ্যে। কারো কারো মনে সংসারী হওয়ার ইচ্ছা তাকলেও সে ইচ্ছাকে অন্তত আরো কয়েক বছরের জন্যে এ উদ্দামতার ভেতর চাপা দিয়ে রাখলো তারা।[১]

ইউরোপের ইতিহাস নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করতে চাই না। যেসব কারণ এবং ঘটনা প্রবাহ ইউরোপীয় ইতিহাসে নারী জীবনকে প্রভাবিত করেছে, আমরা কেবল সে ব্যাপারেই আগ্রহী। শিল্পবিপ্লব কি সাংঘাতিকভাবে ইউরোপের নারী এবং শিশু সমাজকে শ্রমভারে ন্যুব্জপৃষ্ঠ করেছে, তার আভাস দেয়া হয়েছে আগের পৃষ্ঠাগুলোতে। পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল এবং গ্রন্থিচ্যুত করেছে এ পরিবর্তন। যার পরিণামে টুকরো টুকরো হয়ে একেবারে ভেঙ্গে গুড়িয়ে যায় পারিবারিক জীবন। কিন্তু এজন্য সবচয়ে বেশী মূল্য দিতে হয় নারীকে। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় তাকে শিকার হতে হলো কঠোরতম শ্রমের। হারালো সে তার সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু বিনিময়ে তেমন কিছুই জুটলো না তার ভাগ্যে। মানসিক কিংবা বস্তুগত কোনো দিক থেকেই সুখী এবং তৃপ্ত হতে পারলো না সে। পুরুষ কেবল নারীর অভিভাবকের দায়িত্ব থেকেই সরে দাঁড়ালো না, নারীর ওপর চাপালো নারীর নিজের প্রতিষ্ঠার এবং ভরণ-পোষণের দায়িত্ব। স্ত্রী কিংবা জননী সবার ক্ষেত্রেই চাপানো হলো এ বোঝার গুরুভার, কারখানার কাজে তাকে নির্মমভাবে শোষণ করলো কারখানা মালিকগণ। অনেক বেশী সময় ধরে তাকে কাজ করতে হলো সেখানে। কিন্তু একই কারখানায় একই ধরনের কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক দেয়া হতো পুরুষকে, তাকে দেয়া হতো তার চেয়ে অনেক কম।

কেন এসব ঘটলো সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। কেননা ইউরোপের কৃপণতা, অনুদারতা এবং নির্মমতার কথা কম-বেশী সবারই জানা। মানুষকে কখনো মানুষ হিসেবে সম্মান দিতে শেখেনি এ মহাদেশ।

---

১. বস্তুবাদ আর মার্কসীয় দর্শনের প্রবক্তাগণ এসব তথ্যের ভিত্তিতেই দাবি করছেন ঃ অর্থনৈতিক অবস্থাই পুরোপুরি দায়ী সামাজিক অবস্থার জন্য এবং শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিবেশই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে মানুষের যৌথ বা পারস্পরিক সম্পর্ক। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে কর্মধারার গুরুত্বকে আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণই মানুষের চিন্তা, অনুভূতি এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এ ধারণা ভুল। আসলে কোনো উচ্চতম নৈতিক আদর্শ না থাকার ফলেই ইউরোপীয় জীবনে এতোটা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছে অর্থনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। ইসলামী জগতের মতো কোনো মহৎ নৈতিক অনুশাসন থাকলে আত্মিক দিক থেকে সমুন্নত হতে পারতো ইউরোপ। আর এর ফলে ইউরোপীয়রা পারতো খাঁটি মানবিক আদর্শে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে সংহত করে তুলতে। এতে করে সে কেবল তার অর্থনৈতিক চাহিদাই অনুধাবন করতে পারতো না, বাদবাকী দুনিয়ার মানুষকে রেহাই দিতে পারতো তার শোষণ এবং বিত্ত লালসা সঞ্জাত চরম পীড়ন আর দুর্গতি থেকে।

মানুষের ক্লেশ এবং দুর্গতি মোচনের জন্য স্বেচ্ছায় তাকে কোনো মহৎ কাজে আত্মনিবেদিত হতেও দেখা যায়নি সে পরিমাণে, যতোটা সে মুক্তকচ্ছ হয়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট করেছে মানব-সমাজকে। এর সাক্ষ্য দেবে ইউরোপের অতীত, এমনকি তার বর্তমানও। অনাগত বছরগুলোতে এ অবস্থার পরিবর্তন হবে এমন কোনো লক্ষণ স্পষ্ট নয় দৃষ্ট-দিগন্তে। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি তাকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করেন এবং আলোকিত করেন তার আত্মাকে, তবেই কেবল সম্ভব হতে পারে বাঞ্ছিত পরিবর্তন।

অবশ্য এমন কিছু বিবেকবান মানুষও সেখানে ছিলেন যাঁরা নীরবে সহ্য করতে পারেননি জনসংখ্যার দুর্বল অংশের প্রতি এ ন্যক্কারজনক অবিচার। শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার অবসান ঘটানোর জন্যে সংগ্রাম করলেন তাঁরা। এখানে লক্ষণীয়, এ সংগ্রামটা স্রেফ শিশুদের জন্য, নারী মুক্তির জন্য নয়। অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের শ্রমিক হিসেবে কারখানায় নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন সমাজ সংস্কারকরা। যুক্তি দেখালেন, অল্প বয়সে কাজের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে রুদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে তাদের দেহের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি। তাছাড়া রুক্ষ এবং কষ্টসাধ্য কাজের জন্য তাদের দেয়া হচ্ছে নগণ্য পারিশ্রমিক। সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে উচ্চারিত এ প্রতিবাদ ব্যর্থ হয়নি শেষ পর্যন্ত। পাওয়া গেল এর সুফল। আস্তে আস্তে বাড়ানো হলো মজুরির হার। আর সে সাথে সংকুচিত করা হলো শ্রমের মেয়াদ বা শ্রম-ঘন্টা।

কিন্তু তখন পর্যন্তও কেউ এগিয়ে এলো না নারীর অধিকার আদায়ের দাবি নিয়ে। এর জন্য যে উদারতা আর মানসিক উৎকর্ষের প্রয়োজন, ইউরোপীয়দের তা ছিল না। ফলে অস্তিত্ব রক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনে কঠিন এবং দুঃসহ শ্রমের এ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আপন পথ করে নিয়ে চলতে হলো নারীকে। একই কাজ ও মেহনত করেও সহপুরুষ শ্রমিকের চেয়ে অনেক কম মজুরী পেয়ে তৃপ্ত থাকতে হলো তাকে।

ঘটনার নাটকীয় পরিবর্তনের সূত্রপাত হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে। লাখ লাখ ইউরোপীয় আর আমেরিকান তরুণ নিহত হলো এ আগ্রাসী যুদ্ধে। বিধবা হলো অগণিত নারী। চরম এক বিড়ম্বনার শিকার হলো এ ভাগ্যহীনার দল। এদের প্রতিপালনের ভার নেয়ার মতো কেউ থাকলো না। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো না কেউ। বেশীর ভাগ পরিবারেরই রোজগারী পুরুষ নিহত হলো যুদ্ধে কিংবা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে

থাকলো সারা জীবনের জন্য। যুদ্ধের আতংকে স্নায়ুবিক উত্তেজনায় আর বিষাক্ত গ্যাসের শিকার হয়ে উন্মাদ এবং অকর্মণ্য হলো অনেকে। যুদ্ধ-বন্দী শিবির থেকে একটানা চার বছর নির্যাতন ভোগ করে ফিরে এলো যারা তাদেরও আর থাকলো না কাজের উদ্যম। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তারা নিলো বিশ্রাম। বিয়ে করে পরিবার প্রতিপালনের মনোবল হারালো এরা প্রায় সবাই। এদের দৈহিক এবং আর্থিক সংগতির ওপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো এ মানসিক আড়ষ্টতা।

জনশক্তির এক প্রকাণ্ড ঘাটতি দেখা দিলো যুদ্ধের ধ্বংসলীলার অবধারিত পরিণাম হিসেবে। যারা বেঁচে ছিলো তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না এতো বড় একটা শূন্যতা ভরাট করা। শ্রমিকের অভাবে নতুন করে চালু করা সম্ভব হলো না কল-কারখানা। সম্ভব হলো না যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে ওঠা। চরম ও অচলাবস্থা নারীকে বাধ্য করলো পুরুষের শূন্য স্থান পূরণ করতে। এ দায়িত্ব নিতে এগিয়ে না এলে না-খেয়ে থাকতে হতো তাদের। দুর্ভিক্ষে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হতো বৃদ্ধা মহিলা আর অনাথ শিশুদের, যারা ছিলো তাদের পোষ্য।

জীবনযাত্রার দুয়ার প্রশস্ত হলেও প্রকৃতিগত কমনীয় বৈশিষ্ট্য বিরাট এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো এখন নারী শ্রমিকদের সামনে। কারখানায় রাত-দিন কাজ করে, ঘরের বাইরে পড়ে থেকে নৈতিকতা কিংবা নারী-সুলভ স্বভাব রক্ষা সম্ভব ছিলো না তাদের কারো পক্ষেই। কেননা কারখানা মালিকগণ শুধু তাদের শ্রম নিয়েই তুষ্ট থাকতো না, সে সাথে তাদের ভোগ করতেও চাইতো। যুদ্ধ-বিড়ম্বিতা নারী সমাজের অসহায় অবস্থা এমন একটা অবাধ সুযোগই এনে দিলো এ ইন্দ্রিয়-বিলাসীদের জন্য।

এভাবে পাশাপাশি দু-রকমের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হলো নারীকে। কারখানায় গতর খাটুনির পর মালিককে খুশী করতে হতো তাকে সাধ্যমত। আরেকটি কথা, কেবলমাত্র পেটের ক্ষুধাই গ্রাস করলো না নারীকে, যৌন-কামনাও নিজের হিস্যা দাবি করলো তার কাছ থেকে। যুদ্ধ নিদারুণভাবে ছাঁটাই করলো পুরুষদের সংখ্যা। এ অবস্থায় বিয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক যৌনতা তৃপ্ত করা সম্ভব হলো না সব নারীর পক্ষে। এ রকম জরুরী সংকটের মোকাবেলা করেছে ইসলাম একাধিক বৈধ বিবাহের স্বীকৃতি দিয়ে। কিন্তু ইউরোপের প্রচলিত ধর্মে ছিল না একের বেশী স্ত্রী প্রতিপালনের অনুমোদন। ফলে যৌবনের তাড়নায় জর্জরিত হতে হলো নারীকে।

অবদমিত ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য তাকে বেছে নিতে হলো অবাধ বিচরণের পথ, উচ্ছৃঙ্খলতার পথ। পেটের ক্ষুধার সাথে যুক্ত হলো অতৃপ্ত যৌনতা, দামী পোশাক আর প্রসাধনীর প্রতি প্রচণ্ড মোহ। এসব কিছু একাকার হয়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো অধঃপতনের শেষ প্রান্ত সীমায়।

উদ্দেশ্যহীন অসুন্দর এ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকলো পাশ্চাত্য নারী। ভোগ আর বিলাসের কাম্য সামগ্রী পাওয়ার জন্য পুরুষের মনোরঞ্জন করে চললো সে। ঘানি টানতে থাকলো কলে, কারখানায় আর পণ্যশালায়। কিন্তু এতেও সে তৃপ্ত থাকতে পারলো না। পাওয়ার মোহ আরো তীব্র এবং উন্মাদ হয়ে উঠলো। অতৃপ্ত এ চাহিদা পূরণের জন্য আরো বেশী করে খাটতে হলো তাকে। নারীর এ দুর্বলতার সুযোগ পুরো মাত্রায় নিলো কারখানা-মালিকগণ। তারা আদায় করে নিলো তার থেকে বাড়তি শ্রম। কিন্তু বঞ্চিত করলো তাকে ন্যায্য মজুরী থেকে। একই কাজের জন্য পুরুষ-শ্রমিক যে মজুরী পেতো নারী-শ্রমিককে দেয়া হতো তার চেয়ে অনেক কম। এ ছিলো এক অবমাননাকর বৈষম্য। যুক্তি কিংবা বিবেক কখনো সমর্থন করতে পারে না এমন গর্হিত অন্যায়কে।

সর্বাত্মক একটা বিপ্লবকে অনিবার্য করে তুললো দুঃসহ এ সামাজিক পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত ঘটে গেলো বিপ্লব। তার কূলপ্লাবী স্রোত ধুয়ে-মুছে গেলো শতাব্দী-প্রাচীন বৈষম্য আর অন্যায়ের গ্লানি।

কিন্তু কি পেলো এ বিপ্লব থেকে ইউরোপীয় সমাজের নারী ? অতিরিক্ত দৈহিক শ্রমে সে ক্লান্ত, ন্যুব্জপৃষ্ঠ এবং হতশ্রী। বিসর্জিত তার নারীত্ব এবং মর্যাদা। সন্তানের গর্বিতা জননী হয়ে সংসার ধর্ম পালনের স্বাভাবিক আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। সন্তান, স্বামী আর পরিবারের সবার সাথে সুখ-দুঃখের সমান ভাগী হওয়ার মধ্যে ঘটে নারীত্বের এবং মাতৃত্বের গভীর উপলব্ধি। তার হৃদয় বিকশিত হয় করুণায়, মমতায় আর কল্যাণবোধে। অধিষ্ঠিত হয় সে মহিমার চূড়ায়। কিন্তু ইউরোপীয় নারী সংসার জীবনের এ গৌরব পেলো না সমাজে রূপান্তর ঘটে যাওয়ার পরও। কেবল জয়ী হলো সে একটা জায়গায়। পেলো পুরুষের সমান মজুরির অধিকার। এর বেশী প্রাপ্যমর্যাদা তাকে দিতে পারলো না ইউরোপ।

কিন্তু খুব একটা সহজে ইউরোপের আত্মগর্বী পুরুষ সমাজ ছাড়েনি নারীর ওপর তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি। বিনা বাধায় মেনে নিতে রাজী হয়নি

কোনো অধিকারই তাকে ছেড়ে দিতে। এজন্য লড়াইতে নামতে হয়েছে নারীকে। সে লড়াই ছিলো সুদীর্ঘ এবং উত্তেজনাময়। প্রচলিত এমন কোনো হাতিয়ার ছিল না যা ব্যবহার করা হয়নি এতে। প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েই ইউরোপীয় পুরুষ-সমাজ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো নারীর সমান অধিকার মেনে নিতে। মুক্তি আন্দোলনকে সফল করার জন্য নানা উপায়ের আশ্রয় নিতে হলো নারীকে। ধর্মঘট করা হলো কলে-কারখানায়। শুরু হলো অসহযোগ। সভা-সমিতি করে বলা হলো সমান অধিকারের কথা। একটানা লেখালেখি চললো সংবাদপত্রে নারী মুক্তির স্বপক্ষে। এরপর সে বুঝলো পুরোপুরি অধিকার আদায় করে নিতে হলে তাকে অংশ নিতে হবে আইন রচনায়। প্রথমে সে দাবি করলো ভোটের অধিকার। তারপর আন্দোলনে নামলো পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য। শিক্ষা-দীক্ষায় পুরুষের সমকক্ষ হওয়ায় সরকারী চাকুরী আর সরকার পরিচালনায়ও সে তুললো সমান শরীকানার দাবি।

ইউরোপের নারী-মুক্তি সংগ্রামের এ হলো মোটামুটি চিত্র। বহিপ্রকাশে বিভিন্নতা থাকলেও সবটাই একই কাহিনীর সাথে যুক্ত ঘনিষ্ঠভাবে। এ সংগ্রামে সফলতার সাথে পুরুষকে বহিষ্কৃত করলো নারী সমাজের কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বের আসন থেকে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক এ পরিবর্তন মেনে নিতে হলো পুরুষকে। না-মেনে তার উপায়ও ছিল না। কিন্তু অচিরেই নারী বুঁঝলো নতুন বিবর্তন ভাংগনমুখী যে সমাজের জন্ম দিয়েছে সেখানে পুরুষের মতো সে-ও অসহায়।[১] এতোকিছু সত্ত্বেও অনেক অসমতার আজো কিন্তু অবসান ঘটেনি। পাঠকরা জেনে অবাক হবেন, গণতন্ত্রের জন্মস্থান খোদ ইংল্যাণ্ডেই টিকে আছে পুরাতন এ বৈষম্য। সেখানে সরকারী দফতরগুলোতে কাজ করেন যেসব মহিলা তাঁরা অনেক

---

১. এসব তথ্য প্রমাণ সামনে রেখেই মার্কসবাদীরা দাবি করেন, অর্থাৎ নৈতিক কারণই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব কারণ যা নিয়ন্ত্রণ করে জীবনের গতিধারাকে। তাঁদের মতে, ইউরোপীয় নারীর সমস্যাও এ অর্থনৈতিক কার্যকারণেরই ফল। জীবনে অর্থনৈতিক ঘটনাক্রমের গুরুত্ব রয়েছে একথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু একই সাথে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইসলামের মতো আদর্শ এবং জীবনব্যবস্থা থাকলে ইউরোপের চেহারা অন্য রকম হতো। কেননা, ইসলাম পুরুষকে বাধ্য করেছে সর্বক্ষেত্রে নারীর পৃষ্ঠপোষকতা করতে। কোনো পরিস্থিতিতে নারী যদি আদৌ দৈহিক শ্রমের কাজ বেছে নেয়, সেক্ষেত্রে সমমর্যাদা হিসেবে পুরুষের সমান মজুরী পাবে সে। যুদ্ধের মতো জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে সংকটের সঠিক, সফল এবং নিষ্কলুষ সমাধানের জন্য একাধিক বিয়ের ব্যবস্থা রেখেছে ইসলাম। ফলে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অবস্থার শিকার হয়েও নারীকে নিতে হয় না কঠোর পরিশ্রমের কাজ। স্বাভাবিক যৌন চাহিদা পূরণের জন্যে আশ্রয় নিতে হয় না নোংরা পথের।

ক্ষেত্রে কম মাইনে পান পুরুষ চাকুরেদের চেয়ে। অথচ বৃটিশ পার্লামেন্টে সম্মানিতা মহিলা-সদস্যের সংখ্যা এখন অনেক।

এর প্রেক্ষিতে ইসলামে নারীর স্থান কোথায়, তার একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই আমরা। দেখতে চাই ইসলামে এমন কোনো ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, অর্থনৈতিক কিংবা আদর্শগত বা আইনগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিনা যার ফলে নারী বাধ্য হতে পারে তার পাশ্চাত্য সহগামিনীর মতো অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের ময়দানে নামতে। অথবা এটা কি কোনো হীনমন্যতা কিংবা পাশ্চাত্যের অনুকরণের ফল যার দরুন নারী মুক্তির প্রতীচ্য প্রবক্তারা তার অধিকারের জন্য গলা উঁচিয়ে সরগরম করে তুলছে বাতাস ? ঝড় তুলছে সভা মঞ্চে ?

মৌল আদর্শ হিসেবেই ইসলাম পুরুষের মতোই নারীকে গণ্য করে মর্যাদাবান মানবিক সত্তা হিসেবে। তফাৎ করে না পুরুষের আত্মায় আর নারীর আত্মায়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে মানবগণ ! তোমাদের স্রষ্টা প্রভুর বিষয়ে (তাঁর প্রতি তোমাদের কর্তব্যের ব্যাপারে) সতর্ক থেকো। যিনি একক অস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সবাইকে। একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সহচরকে এবং এ দু'থেকে বিস্তৃত করেছেন অসংখ্য পুরুষ আর নারীকে।"-সূরা আন নিসা ঃ ১

এভাবে জন্মগতভাবেই ইসলামে নারী এবং পুরুষের মর্যাদা সমান। ইহলোকে এবং পরলোকেও তাদের মর্যাদা অভিন্ন। সুতরাং একই এবং সমান অধিকারের দাবিদার তারা। ইসলাম নারীকে দিয়েছে জীবন যাত্রার পরিপূর্ণ অধিকার আর সম্মান। দিয়েছে সম্পত্তিতে পুরুষের মতো অধিকার। সমাজে সর্বোচ্চ তার আসন। সবার শ্রদ্ধার পাত্রী সে। তাকে অপমানিত করার কিংবা তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অধিকার দেয়া হয়নি কাউকেই। নারী-ধর্ম পালনের জন্য তাকে খাটো করে দেখারও অধিকার নেই অন্য কারো। এ অধিকারগুলো সমানভাবে ভোগ করবে নারী-পুরুষ উভয়েই। সামাজিক মর্যাদা এবং অধিকারের প্রশ্নে কোনো পার্থক্য নেই তাদের মধ্যে। এ ব্যাপারে যে আইন রয়েছে তা উভয়ের জন্য প্রযুক্ত। উভয়কে অবশ্য কর্তব্য হিসেবে পালন করতে হবে এ আইনের বিধান। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ "হে বিশ্বাসীগণ ! তোমাদের মধ্যে কেউ যেন অন্যের প্রতি কটাক্ষ (বিদ্রূপ) না করে। কেননা, হয়তো সে-ই শ্রেষ্ঠ (শেষের জন) আগের জনের চাইতে। তোমরা একে-অপরের নিন্দা করো

না, (কুৎসাসূচক) ছদ্ম নামে একে-অপরকে বিদ্রূপ করো না -সূরা আল হুজুরাত ঃ ১১। "কেউ কাউকে ঘৃণার চোখে দেখো না। আড়ালে অন্যের বদনাম করো না।"-সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২। "হে বিশ্বাসীগণ ! আগে অনুমতি না নিয়ে এবং গৃহবাসীদের অভিবাদন (সালাম) না জানিয়ে তোমাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করো না" -সূরা আন নূর ঃ ২৭। মহনবী স. বলেছেন ঃ "একজন মুসলমানের প্রাণ, সম্মান এবং সম্পদ হরণ অন্য মুসলমানের পক্ষে হারাম।"-বুখারী, মুসলিম

সৎ কাজের পুরস্কার তথা প্রতিদান নারী-পুরুষের জন্য সমান। আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ "এবং তাদের প্রতিপালক শুনেছেন তাদের কথা। (এবং বলেছেন) দেখ ! আমি কোনো কর্মীরই, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক, কোনো কাজ নিরর্থক যেতে দেই না। আমরা একটি থেকে উৎপাদন করি অন্যটি (অর্থাৎ ভালো কাজের সুফল প্রদান করি)।"-সূরা আল ইমরান ঃ ১৯৫।

ইহজগতে বস্তুগত চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও অভিন্ন নারী-পুরুষের অধিকার। সম্পত্তির ভোগদখল করতে পারে তারা ইচ্ছা মতো। সম্পত্তি হস্তান্তরও করতে পারে যখন খুশী। পারে নির্বাধে সম্পত্তি বন্ধক দিতে, ইজারা দিতে কিংবা কাউকে দান করতে। নিজেদের স্বার্থে তারা সম্পত্তি কেনা-বেচা করতে এবং তার থেকে ফায়দাও ওঠাতে পারে সমান অধিকার নিয়ে। ঐশী গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "পিতা-মাতা এবং নিকট স্বজনরা যা কিছু রেখে যায় তার একটা হিস্যা পাবে পুরুষেরা এবং একটা হিস্যা পাবে নারীরা যা কিছু রেখে যায় তাদের পিতা-মাতা আর নিকট স্বজনরা।-সূরা আন নিসা ঃ ৭। "পুরুষরা যা অর্জন করেছেন তার একটা অংশ তাদের প্রাপ্য এবং নারীরা যা অর্জন করেছেন তার একটা অংশ তাদের প্রাপ্য"-সূরা আন নিসা ঃ ৩২।

সম্পত্তির মালিকানা এবং ইচ্ছামতো সম্পত্তি ভোগ কিংবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামের স্বীকৃত নারীর এ অধিকার আমাদের দৃষ্টিতে নিবদ্ধ করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগের দিকে। প্রথমে আসা যাক ইউরোপের প্রসংগে। এ সে দিনও 'সভ্য' ইউরোপের বিধিবদ্ধ আইন সম্পত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো একটি অধিকারও দেয়নি নারীকে। বড়জোর একজন পুরুষের মাধ্যমে কেবল পরোক্ষভাবেই সে পারতো এসব অধিকার ব্যবহার করতে। সে পুরুষ হলো তার স্বামী, পিতা কিংবা অভিভাবক। এরাই ছিল তার ইচ্ছার নিয়ামক। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামে নারীর এসব

অধিকার স্বীকৃত হওয়ার এগারো'শ বছর পরও ইউরোপের নারী বঞ্চিত ছিলো এ প্রাপ্য অধিকার এবং মর্যাদা থেকে, শেষ অবধি অধিকার আদায় করে নিলেও সহজে তা আসেনি তার নাগালে। আবার অধিকার অর্জনের কঠিন লড়াইতে নামতে গিয়ে চরম মূল্য দিতে হলো তাকে। খুইয়েছে সে তার নারীসুলভ চরিত্র এবং কমনীয়তা। হারিয়েছে সম্মান এবং ব্যক্তিগত মহত্ত্ব। এতোকিছু হারানোর পরও আরো মূল্য দিতে হলো তাকে। কঠোর শ্রমের শৃংখলে বন্দী হতে হলো এবং শিকার হতে হলো চরম দুর্গতির, দৈহিক ক্লেশের এবং মৃত্যুর। ইসলাম নারীকে যা দিয়েছে, এতো সংগ্রাম এবং ভোগান্তির পরও সে পেলো তার তুলনায় অতি সামান্যই। অথচ ইসলাম কোনো অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে পড়েনি কিংবা কোনো সামাজিক শ্রেণী-সংঘাতেরও মুখোমুখি হয়নি নারীর অধিকারের প্রশ্নে। মৌলিক মানবিক অধিকার হিসেবেই নারীকে সমতার এ গৌরব দিয়েছে ইসলাম। মানবিকতার দুটি প্রাণবস্তু হলো সত্য এবং ন্যায়। স্বপ্নের রাজ্য নয়। বাস্তবেই ইসলাম এ দুই আদর্শকে রূপ দিয়েছে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দিয়ে।

এবার আসা যাক, সাম্যবাদী দর্শন এবং সাধারণ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগীর প্রসংগে। এ প্রশ্নে এ দু-দৃষ্টিভংগীতে তেমন একটা তফাৎ নেই। এদের ধারণা অর্থনৈতিক অস্তিত্বের সাথে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত মানব-জীবন। সুতরাং সম্পত্তির মালিকানা এবং ইচ্ছামতো সম্পত্তির ভোগ দখল ও ব্যবহারের অধিকার অর্জন না করা পর্যন্ত আদৌ নারীর কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না। স্বাধীন অর্থনৈতিক অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই কেবল নারী অর্জন করলো মানবিক মর্যাদা। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত যখন সে সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার আদায় করতে পারলো এবং কোনো পুরুষের ওপর নির্ভর না করে নিজের ইচ্ছামতো প্রত্যক্ষভাবে সম্পত্তি ব্যবহারের সুযোগ পেলো, তখনি কেবল স্বীকার করে নেয়া হলো তার মানবিক মর্যাদা।

মানব জীবন সম্পর্কে এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা মেনে নিতে পারি না শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অস্তিত্বের স্বার্থে মানব-জীবনে এমন অবনয়ন এবং অবমাননাকে। কিন্তু তা হলেও নীতিগতভাবে আমরা একটা বিষয়ে একমত এ মার্কসবাদী এবং পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের সাথে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা এবং আত্ম-মর্যাদাবোধ সঞ্চারে সহায়তা করে, একথা আমরা স্বীকার করি। আর এ ক্ষেত্রটিতে ইসলামের অবদান অসামান্য। কেননা, ইসলামই প্রথম নারীর স্বাধীন

অর্থনৈতিক সত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সম্পত্তির মালিকানার এবং ভোগদখলের অখণ্ড অধিকার দিয়েছে নারীকে। কোনো মধ্যবর্তী ছাড়াই নারী পারে নিজের এ অধিকার ভোগ করতে, প্রয়োগ করতে। এজন্য কোনো অছি, মধ্যস্থ কিংবা অভিভাবকের প্রয়োজন নেই তার। শুধু তাকে অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি ইসলাম। নারী জীবনের সব থেকে বড় যে সমস্যা সেই বৈবাহিক প্রশ্নেও ইসলাম দিয়েছে তার স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি। দিয়েছে তাকে স্বাধীন মতামতের নিরঙ্কুশ অধিকার। বিয়েতে কনের অনুমোদন একটি অপরিহার্য শর্ত। বিয়ে বৈধ কিংবা আইনসিদ্ধ হয় না তার মত ছাড়া।

মহানবীর একটি বাণী স্মরণযোগ্য। এ প্রসংগে মহানবী স. বলেছেন ঃ "কোনো বিধবাকে বিয়ে দেয়া যাবে না তার সাথে আলোচনা না করে। কোনো কুমারীকে বিয়ে দেয়া যাবে না তার মত না নিয়ে এবং তার নীরবতা হলো (এ ব্যাপারে) তার সম্মতি"-(বুখারী এবং মুসলিম)। এখানে 'নীরবতা' মানে বিয়েতে কনের নীরব সায়। এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হয়ে যাবার পরও যদি ঘোষণা করে বিয়েতে তার মত ছিল না, তাহলে তখনই বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

নারী-পুরুষর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজব্যবস্থার আগে অবস্থা কেমন ছিলো তা একবার খতিয়ে দেখা দরকার। এক কথায় বলতে গেলে নারী ছিলো তখন আমৃত স্বামী নামক একটি পুরুষের স্বেচ্ছাচারের শিকলে বাঁধা। অত্যাচারী স্বামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নানান ছলনার এবং কখনো পাপ-কুটিল পথের আশ্রয় নিতে হতো নারীকে। স্বৈরিণী হতে বাধ্য হতো সে। তখনকার সমাজব্যবস্থা কিংবা প্রচলিত আইনে কোনো অবস্থাতেই স্বামী বর্জনের অধিকার ছিল না নারীর। ইসলাম প্রথম নারীকে দিলো স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের সরাসরি আইনগত অধিকার। এ অধিকার স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। আইনের এ অধিকার বলে যখন ইচ্ছা সে স্বামীর সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারে।[১] কেবল এখানেই থেমে থাকেনি ইসলাম। নারীকে সমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করাবার জন্য আরো এক পা

---

১. প্রাচ্য জগতের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নারীর এ অধিকারকে আপাত দৃষ্টিতে হয়তো বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ইসলাম শিক্ষা কিংবা তার আইন বাস্তবায়নের পথে যেসব বাধা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য ইসলামকে দোষ দেয়া যায় না। ইসলামী সমাজব্যবস্থা পত্তনের প্রথম যুগে নারী নির্বাধে ভোগ করেছে এ অধিকার। ইসলামের আইন প্রণেতা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ স. এবং তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম যুগের খলিফাগণ স্বীকৃতি দিয়েছেন নারীর এ স্বাধীন মতামতকে। আজকের আমাদের দাবি হলো, এসব আইনের বাস্তবায়ন। সে সাথে আমরা চাই অন্যের অন্ধ অনুকরণ থেকে সংক্রমিত অনৈসলামী রীতি, কুপ্রথা এবং যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এ আইনগত বিধান বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে সে সবের অপসারণ।

বাড়িয়েছে সামনে। নিজের পছন্দ মতো যে কোনো পুরুষকে স্বামী হিসেবে বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছে ইসলাম তাকে। মাত্র আঠারো শ' শতকে বহু চড়াই-উতরাই পার হয়ে ইউরোপীয় নারী অর্জন করলো এ অধিকার। তারপরও এর সপক্ষে গাল-গল্পের অন্ত নেই সেখানে। আজো ইউরোপে এ কৃতিত্ব অতীত-অচলায়তনের বিরুদ্ধে নারীর এক মহাবিজয় হিসেবে নন্দিত।

নারীকে শিক্ষার পথে সমানতালে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও একইভাবে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে ইসলাম। এমন একটি যুগে জ্ঞান-চর্চাকে মানব জাতির জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছিল ইসলাম যখন তাবৎ দুনিয়া অবলুপ্ত অন্ধতা আর অজ্ঞানতার তিমিরে। সে গাঢ় তমসায় যেন কি এক অলৌকিক সংকেতে খুলে গেলো আলোর মুক্ত দুয়ার। সুবিধাভোগী কোনো বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয়-সবার জন্য, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের জন্য প্রথম উন্মুক্ত হলো জ্ঞানের সুবিশাল সড়ক। ব্যক্তি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হলো জ্ঞানচর্চা। মৌলিক অধিকার হিসেবে পাশাপাশি অজস্র গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠার সুযোগ পেলো নারী সমাজ। প্রকৃত মুমিন এবং নিষ্ঠাবান আদর্শচারী হিসেবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মুসলমানের জন্য, তাদের বিশ্বাস আর আনুগত্যের শর্ত হিসেবে জ্ঞানচর্চাকে বাধ্যতামূলক করলো ইসলাম। এখানেও ইসলাম নারীকে দিয়েছে তার স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন মানবিক মর্যাদা। নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করেছে ইসলাম : জ্ঞান ছাড়া পূর্ণাঙ্গতা অর্জন সম্ভব নয় নারীর পক্ষে। ইসলামী অনুশাসনে পুরুষের মতোই শিক্ষার সাধনা নারীর একটি পবিত্র কর্তব্য। কেননা, নারীকে আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য হিসেবেই ইসলাম এমন বিরাট গুরুত্ব দিয়েছে নারীর দৈহিক সত্তার বিকাশের পাশাপাশি তার বিবেকী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের ওপর। অথচ এই সেদিনও শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার স্বীকার করেনি ইউরোপ। শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সমস্যার চাপে পড়েই কেবল বাধ্য হলো ইউরোপীয় সমাজ নারীর জন্য শিক্ষাঙ্গনের দুয়ার খুলে দিতে। এক্ষেত্রে ইসলামী সমাজ- ব্যবস্থাই প্রথম নতুন পথের দিশা দিলো গোটা মানব জাতিকে। মানব-সভ্যতার জন্য এ অবদানের মূল্য কতখানি, তা আঁচ করা যাবে বিষয়টাকে নির্বিকার মন নিয়ে বিচার করলে, সংস্কারমুক্ত হয়ে সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করা হলে।

কিন্তু এরপরও ইসলামকে শিকার হতে হয়েছে বিকারগ্রস্তদের মিথ্যা এবং কুৎসিত সমালোচনার। তাদের অভিযোগ : "ইসলামে নারীর স্থান দ্বিতীয় স্তরে। তাকে পুরুষের দাসী হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। নারীর কোনো

ভূমিকা নেই জীবনে কিংবা জীবনযাত্রায়।" এদের আরো ধারণা ঃ "ইসলামের দৃষ্টিতে নারী একটি গৌণসত্তা। তার কোনো গুরুত্ব নেই সমাজে।" এসব অভিযোগের মধ্যে এক বিন্দুও যে সত্য নেই, তার প্রমাণ ওপরের বর্ণিত তথ্য। নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত না হলে নারী শিক্ষার ওপর কেনো এমন অসাধারণ গুরুত্ব দিলো ইসলাম? এ থেকে কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, ইসলামে নারীর আসন কতখানি উঁচুতে? প্রকৃতপক্ষে এসব বাস্তব সত্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনে, সমাজে এবং আল্লাহর কাছে নারীর আসন এক মহিমান্বিত মর্যাদার আসন।

মানবিক সত্তা হিসেবেই নারী-পুরুষের অভেদ মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ইসলাম। তাদের অধিকার সমান, মর্যাদায় তারা অভিন্ন। কিন্তু তাহলেও নারী-পুরুষের জীবনের একটি সার-সত্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে পারেনি ইসলাম। সে হলো তাদের জীবনাচার এবং কর্মাঙ্গনের স্বাতন্ত্র্য। দায়িত্ব ও কর্তব্যের এ সুনির্দিষ্ট পরিধিকে সামনে রেখেই নারী-পুরুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের একটি সীমারেখা টানছে ইসলাম। এ স্বাতন্ত্র্য বাস্তব কর্মক্ষেত্রের, অসমতার নয়। অথচ এ বাস্তবতার বিরুদ্ধে সোচ্চার কিছু মহিলা সংগঠন। এদের সমর্থন যোগাচ্ছে এক শ্রেণীর লেখক, সংস্কারক ও তরুণ।

প্রথমেই প্রশ্ন করতে হয় ঃ পুরুষরা এবং নারীরা কি একই লিঙ্গ বা যৌনসত্তার অন্তর্গত? না তাঁরা আলাদা যৌনসত্তা? তাদের জীবনধারা কি অভিন্ন? অথবা নারী এবং পুরুষ হিসেবে স্পষ্ট কোনো স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তাদের জীবনধারায়? জীবন চারণায়? এখানেই আছে সমস্যার জট এবং মূল শিকড়। আধুনিক নারী আন্দোলনের অগ্রচারিণীরা, তাদের সমর্থক লেখক, সংস্কারক এবং নব্য তরুণরা এ প্রশ্নের জবাব কি করে দেবেন জানি না। তাঁরা যদি মনে করে থাকেন দৈহিক গঠন, আবেগ-অনুভূতি, ইন্দ্রিয়-চেতনা আর জৈবিক প্রবৃত্তির দিক থেকে কোনো রকম পার্থক্য নেই নারী-পুরুষে, তাহলে তাদের কিছু বলার থাকে না আমাদের। যদি তাঁরা কেবল এটুকু স্বীকার করেন, নারী আর পুরুষে এবং উভয়ের জীবনধারায় একটা পার্থক্য আছে, তাহলে ইসলামের বিধানকে মেনে নিতেই হয়।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

* **নারী মুক্তি আন্দোলন** – শামসুন্নাহার নিজামী
* **দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব** – শামসুন্নাহার নিজামী
* **পর্দা কি প্রগতির অন্তরায় ?** – সাইয়েদা পারভীন রেজভী
* **গোঁড়ামী, অসহনশীলতা ও ইসলাম** – অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ
* **পর্দা ও ইসলাম** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **স্বামী স্ত্রীর অধিকার** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **মুসলিম মা বোনদের ভাবনার বিষয়** – অধ্যাপক গোলাম আযম
* **মহিলা সাহাবী** – তালিবুল হাশেমী
* **সংগ্রামী নারী** – মুহাম্মদ নূরুয্যামান
* **মহিলা ফিক্‌হ (১-২ খণ্ড)** – আল্লামা আতাইয়া খামীস
* **ইসলামী সমাজে নারী** – সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী
* **আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা** – আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ
* **আল কুরআনে নারী (১-২ খণ্ড)** – অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন
* **বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া** – মোঃ আবুল হোসেন বি.এ
* **নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার** – শামসুন্নাহার নিজামী
* **পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন** – শামসুন্নাহার নিজামী
* **আদর্শ সমাজ গঠনে নারী** – শামসুন্নাহার নিজামী
* **পর্দা প্রগতির সোপান** – অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
* **খাদিজাতুল কোবরা** –মায়েল খায়রাবাদী
* **হযরত ফাতিমা যোহরা** –কাজী আবুল হোসেন